দ্বিতীয় অধ্যায়

পেশাভিত্তিক ভাষা-গবেষণার পরম্পরা ও দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজের ভাষা

সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের দেশে সম্প্রতি এই বিস্তৃত ক্ষেত্রের অংশ বিশেষের কর্ষণ শুরু হয়েছে। লিঙ্গ ভেদে ভাষাভেদের বিষয়টা আজ যথেষ্ট আলোচিত। মেয়েদের ভাষা নিয়ে আলাদা করে গবেষণা করেছেন সুকুমার সেন, নির্মল দাস, শর্মিলা বসুদত্ত, সাইফুল্লা প্রমুখ। ধর্মভাষা, জাতিভাষা, নৃভাষা ইত্যাদি বিষয়েও কমবেশি আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণার বিষয়টি বর্তমানে বেশ পিছিয়ে। তবে এই বিষয়ে গবেষণা যে একেবারেই হয়নি এমন নয়। কিছু কিছু কাজ হয়েছে, প্রয়োজনের তুলনায় যা নিতান্ত নগন্য। অপরাধ জগতের ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। তাঁর গবেষণা লব্ধ গ্রন্থটি হল-''অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ।'' বর্ধমান জেলার মুচিদের ভাষা নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন সুকুমার সেন। তাঁর– ***"The cust dialect of the muchis in south-east Burdwan"*** প্রবন্ধটি Indian linguistics, volume-16, ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। খুলনা জেলার মাঝিদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর রচনার নাম - ''খুলনা জেলার মাঝির ভাষা।'' প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বর্ষ-৩১, দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। কামার শালের ভাষা প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে অশোক কুমার কুণ্ডু রচিত ''কামারশালের ভাষা'' প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে কৌশিকী পত্রিকায়। বারবনিতাদের পেশা কেন্দ্রিক ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ''বারবনিতার ভাষা''।

পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণার এই দৃষ্টান্ত খুবই সামান্য, কারণ পেশাভেদে ভাষাভেদের উদাহরণ বাংলায় প্রচুর এবং সমস্ত পেশারই নিজস্ব কিছু শব্দকোষ, শব্দবন্ধ থাকে। তাই এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিত বিস্তৃত পরিসরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলা ভাষায় পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণা যেটুকু হয়েছে তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের ''অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ'' পেশাভিত্তিক গবেষণার ধারায় অনন্য উদাহরণ। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক অপরাধ জগৎকে দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে অপরাধ দুই প্রকার, যথা পেশাগত অপরাধ এবং সমাজবিরোধী বা অপেশাগত অপরাধ। তিনি বলেছেন, সমাজ জীবনে মিশে থাকা ডাকাত, চোর, ছিনতাইকারী, পকেটমার এরা সবাই পেশাদার অপরাধী। কিছু মানুষ চুরি, ডাকাতি, পকেটমারী, ছিনতাই প্রভৃতি নোংরা কাজকে তাদের পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, এই সব কাজে যারা যুক্ত তারা সবাই যে পেশাগতভাবে যুক্ত তা নয়। অপরাধ প্রবণতা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তির টানেও বহু মানুষ এইসব পেশায়

যুক্ত হয়। তবে এদের অধিকাংশই দৈনন্দিন জীবনের রসদ সংগ্রহের জন্য অপরাধ মূলক কাজকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছে। লেখক প্রচুর উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন, অপরাধ জগতের ভাষা বেশ সংকেতপূর্ণ। যেমন- 'টিকটিকি', 'মামা', শব্দগুলি অপরাধ জগতে পুলিশকে ইঙ্গিত করে। 'পেটো' শব্দটি 'বোম' কে ইঙ্গিত করে। লেখক মনে করেন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই এর মতো কাজগুলি আমাদের সমাজে নিষিদ্ধ কাজ হওয়ায় এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা পুলিশের হাতে বা জনসাধারণের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে সংকেতপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে। অপরাধ জগতের লোকেরা নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপের সময় প্রচুর স্ল্যাং ব্যবহার করে। তবে এর বিশেষ কোনো কারণের কথা লেখক বলেননি। অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ সম্পর্কে লেখকের একটি বিশেষ বীক্ষণ, এই শব্দকোষ বা শব্দভাণ্ডার অহরহ পরিবর্তিত হয়। তাঁর মতে প্রচলিত সমাজ জীবন থেকে নিজেদেরকে আড়ালে রাখতে এই পরিবর্তন। একই শব্দবন্ধ দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে তা সাধারণ সামাজিকের বোধগম্যতায় চলে আসবে। তাই তারা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করে। যার ফলে পেশাভিত্তিক শব্দভাণ্ডার অনিবার্যভাবে উৎকৃষ্ট হতে থাকে।

ড. মল্লিক প্রতিনিয়ত শব্দ পরিবর্তনের বেশ কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন- 'বোম' শব্দের প্রতিশব্দ 'পেটো' অপরাধ জগতে বহুল প্রচলিত। এছাড়াও 'বোম' এর আরও অনেক প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন- ডিম্, আলু, কদ্মা, কোউটো, নাড়ু প্রভৃতি। 'পুলিশ' শব্দের প্রচলিত প্রতিশব্দ 'টিকটিকি', এছাড়া আরও অনেক প্রতিশব্দের কথা গবেষক উল্লেখ করেছেন। যেমন- 'খোচোর', 'ঝাঁকামুটে', 'মাছি' প্রভৃতি। গবেষক মল্লিক পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলখানা সমীক্ষা করে দেখেছেন এ রাজ্যের অপরাধ জগতে প্রচুর অবাঙালি মিশে আছে। এ কারণেই অপরাধ জগতের ভাষায় হিন্দি শব্দের ব্যবহার বেশি বলে তিনি মনে করেন। 'কাতিল', 'কাফি', 'রিস্তা' শব্দগুলির ব্যবহার অপরাধ জগতে প্রচুর। 'ভাই' শব্দটি অপরাধ জগতের মানুষ পরস্পরকে সম্বোধন করতে প্রায়শ ব্যবহার করে। নিজের দলের, একই কাজের লোকদের এরা ভাই বলে সম্বোধন করে। সামাজিক সম্পর্কের কোনো মূল্য এরা দেয় না। সাধারণত গুণ্ডাবাজির শীর্ষে অবস্থিত লোককে ভাই বলে থাকে এরা। গুণ্ডাবাজির একটি প্রতিশব্দ 'ভাইগিরি'। 'ভাই' আর 'গুণ্ডা' বিষয় দু'টি বর্তমানে এক মাপকাঠিতে চলে এসেছে।

অপরাধ জগৎ আমাদের প্রচলিত সমাজধারার বিপরীতে বয়ে চলা এক কর্ম জগৎ। এর কর্মকাণ্ডের সীমানা ও ক্ষেত্র পুরোপুরি আলাদা। কিন্তু যারা অপরাধ জগতের মানুষ তারা বিচ্ছিন্ন কোনো

দ্বীপের বাসিন্দা নয়। সাধারণ সমাজ জীবনে মিশে থেকেই তারা তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যায়। সাধারণ সমাজ জীবনে মিশে থাকতে হয় বলে তাদের কর্ম জগতের ভাষার সঙ্গে সাধারণ সময়ে ব্যবহার করা ভাষায় পার্থক্য তৈরি হয়। তাই অপরাধীদের অপরাধ মূলক কাজের সময়ে ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে আলাদা করে আলোচনা না করলে সমাজভাষার আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি বেশ দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন ড. মল্লিক। তিনি অপরাধ ও অপরাধীদের শ্রেণি বিচার করে, আলাদা আলাদা ভাবে শব্দভাণ্ডারের উল্লেখ করেছেন। উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন অপরাধ জগতের ভাষার উপর ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্বের প্রভাব; শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব। তবে এ গ্রন্থে সমাজবিরোধী বা অপেশাগত অপরাধীদের ভাষার নমুনা খুব বেশি পাওয়া যায় না। কিন্তু একথা সত্য যে, পেশাদার অপরাধী অপেক্ষা অপেশাদার অপরাধীদের অপরাধ প্রবণতা অনেক বেশি ও হিংস্র ধরনের। কিন্তু এ বিষয়ে ড. মল্লিকের গবেষণা বিশেষ অগ্রসর হয়নি। সাধারণ সমাজকে অপরাধ জগৎ কোন দৃষ্টিতে দেখে সে সম্পর্কে ড. মল্লিক বেশ কিছু কথা বলেছেন। তিনি বলেন- ''অপরাধীদের অধিকাংশের ধারণা, তাদের জীবনের ট্রাজেডির জন্য দায়ী বর্তমান সমাজ। সভ্যভব্য সমাজের ওপর এদের কল্পনাতীত অভিমান। সভ্যভব্যরা ওদের জীবনে উৎপীড়ক ছাড়া আর কিছুই নয় নাকি !'' [১] কিন্তু সাধারণ সমাজ অপরাধ জগৎ সম্পর্কে কেমন ধারণা পোষণ করে, বিশেষত পুলিশ বিভাগ চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারীদের সম্পর্কে কী ভাবে, সে সম্পর্কে গবেষক কিছু বলেননি। কিন্তু এই সংক্রান্ত গবেষণারও প্রয়োজন ছিল। এছাড়া অপরাধ জগতের শব্দকোষ ও সাধারণ সামাজিকের শব্দকোষের একটা তুলনামূলক আলোচনার দরকার ছিল। সে আলোচনা হলেই অপরাধ জগতের ভাষার বিশেষত্ব আমাদের সামনে আরও সুস্পষ্ট হত। তবে কিছু অসম্পূর্ণতার দিক থাকলেও পেশা ভিত্তিক ভাষা গবেষণার এক নির্ভরযোগ্য দলিল '' অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ ''।

সুকুমার সেন ''বর্ধমানের মুচিদের ভাষা'' প্রবন্ধে মুচিদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটি কর্মকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণার নমুনা। প্রচলিত হিন্দু সমাজে মুচিরা নিচু এবং অচ্ছুৎ শ্রেণি। যারা চামড়ার কাজ করে, জুতো তৈরি করে এবং ঢাক বাজায় তারা সকলেই মুচি সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে। ড. সেন বলেছেন- ''অতি সম্প্রতি আমি জানতে পেরেছি, বর্ধমান জেলার দক্ষিণ -পূর্ব অংশে মুচিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় তাঁদের এক নিজস্ব উপভাষা (ডায়ালেক্ট) ব্যবহার করেন। এই মুচি সম্প্রদায়ের

মধ্যে যাঁরা চামড়ার কাজ করেন, জুতো তৈরি করেন এবং ঢাক বাজান---তাঁরা সকলেই আছেন। তাঁদের উপভাষার এক সম্পূর্ণ শব্দভাণ্ডার আছে---তার সাহায্যে তাঁরা সাধারণ বস্তু বা ভাবকে চিহ্নিত করেন। ওই অঞ্চলের মান্য উপভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা থেকে এই শব্দভাণ্ডার সম্পূর্ণ পৃথক।" [২] ড. সেন মুচিদের ভাষার যে শব্দভাণ্ডার সংগ্রহ করেছেন তাকে তিনটি বর্গে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। তাঁর দ্বারা বর্ণিত ভাগগুলো হল--

ক. লুপ্তপ্রায় শব্দ- যা স্থানীয় উপভাষায় বিলীন হয়ে গিয়েছে।

খ. বর্ণনাত্মক বা ধন্যাত্মক শব্দ- যা ঐ উপভাষার সৃষ্টি।

গ. অজ্ঞাত উৎসজাত শব্দ।

ড. সেন উক্ত তিনটি বর্গেরই কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করেছেন যেমন–

লুপ্তপ্রায় শব্দ- ভিট্– চাষের জমি।

বিশেল– পর্যাপ্ত।

চন্না– পা

দেসাও– দাও

কেড়াই– চোখ ঘোরানো

পরক– কাপড়

এঁদেরা– রাত

উপভাষাজাত শব্দ বা বর্ণনাত্মক শব্দ–

বেফাস– লক্ষ্য

ভালুক– জ্বর

চেঁচকা– শিশু

গম্বুজ– মাথা

গুষ্টির পোঁদ– পেঁয়াজ

ফোঁপাসু– সাপ

অজ্ঞাত উৎসজাত শব্দ–

অবঙ্গ– শীত

আঁদ্‌রে– মিষ্টি খাবার

ওল– উঠোন

বইটান– রান্নাভাত

ভেদো– যুবতি

ভোড়েল– মদ বিক্রেতা

হেঁকচে– যৌন ক্রিয়া

আলোচ্য জনগোষ্ঠী কিছু অদ্ভুত সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহার করে। ড. সেন এর কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যথা–

সিকাটে– এক

জোড়টা– দুই

নেয়ো– তিন

গোণ্ডা– চার

আধ চাপড়– পাঁচ (আক্ষরিক –আধ তালি)

চাপড়– দশ (দুই হাতের তালি)

আলোচ্য প্রবন্ধে ড. সেন যে ভাষিক নমুনাগুলি পেশ করেছেন আঞ্চলিক উপভাষার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। মুচি সম্প্রদায় তাদের দৈনন্দিন জীবনে কথা বলার সময় ঐ ভাষায় কথা বলে না। কেবলমাত্র কর্মক্ষেত্রেই তারা এই ভাষার চর্চা করে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল মুচিদের ভাষা সংকেতপূর্ণ কেন? তারা তো সমাজের অন্যান্য সবকিছুর সঙ্গে মিলে মিশেই জীবন যাপন করে। সেক্ষেত্রে তাদের ভাষা অন্যদের থেকে আলাদা কেন? ড. সেন মনে করেন মুচিদের পেশা ও জীবন অন্যান্য জনগোষ্ঠীদের থেকে আলাদা। তাই তারা নিজেদের কাজ ও পেশাকে অন্যদের থেকে আড়াল করার জন্য আঞ্চলিক উপভাষাকে ব্যবহার করে না। প্রসঙ্গক্রমে প্রাবন্ধিক বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের তুলনা করেছেন। তিনি মনে করেন চর্যাপদের কবিরা যে উদ্দেশ্যে সন্ধ্যা ভাষার আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই একই উদ্দেশ্যে

মুচিরাও তাদের ভাষাকে প্রচলিত সমাজভাষার থেকে পৃথক করে নিয়েছে। প্রাবন্ধিক বলেন- '' উক্ত এলাকার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর থেকে তাঁদের বৃত্তি স্পষ্টত পৃথক। এই সাংকেতিক ভাষার সাহায্যে তাঁরা নিজেদের বৃত্তিগত কাজকর্ম বা তার সঙ্গে জড়িত আচার-আচরণকে সার্থক ভাবে গোপন রাখতে পারেন; বা তাকে প্রকাশ করতে পারেন ছদ্মরূপে। মুচিদের এই উপভাষার সঙ্গে প্রাচীন বাঙলার চর্যাগীতির সন্ধ্যাভাষা বা সন্ধ্যাবচনের তুলনা করা যেতে পারে।'' [৩] এ প্রবন্ধে প্রবন্ধিক মুচিদের ভাষা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উদাহরণ এর সাহায্যে দেখিয়েছেন আঞ্চলিক উপভাষা থেকে তাদের ভাষা কতটা পৃথক। কিন্তু পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণার পরিচয় এ প্রবন্ধে পাওয়া যায় না। ড. সেন মুচিদেরকে একটি জাতি হিসাবে বিবেচনা করে তাদের ভাষা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু জুতো তৈরি, ঢাক বাজানো, চামড়ার কাজ প্রভৃতি কাজের কিছু নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি আছে। প্রবন্ধিক সেই কর্মকেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির পরিচয় তেমন দেননি। যদিও আলোচ্য প্রবন্ধে সেই সম্পর্কে আলোচনা থাকার দরকার ছিল। যদি থাকত তবে পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণার ধারায় এই গবেষণাকর্ম বিশেষ মাত্রা পেত।

খুলনা জেলার মাঝিদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর প্রবন্ধের নাম- 'খুলনা জেলার মাঝির ভাষা'। নৌকা চালানো মানুষের আদিম জীবিকা। অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষ নৌকার সাহায্যে নদী পথে যাতায়াত করে। যারা নৌকা চালায় তাদের মাঝি বলে। এই মাঝি সম্প্রদায়ের ভাষা আঞ্চলিক ভাষা থেকে কিছুটা আলাদা। ভাটার টানে মাঝিরা যে গান করে তা ভাটিয়ালী গান নামে পরিচিত। ভাটিয়ালী গানে মাঝি সম্প্রদায়ের ভাষার নমুনা পাওয়া যায়। একটি বিখ্যাত ভাটিয়ালী গান–

''মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।''

এ গানে মাঝিদের পেশা কেন্দ্রিক ভাষা'র নমুনা রয়েছে। 'বৈঠা' শব্দটি মাঝিদের পেশাকেন্দ্রিক শব্দ। 'বৈঠা' হল নৌকা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় এক প্রকার কাঠের টুকরো, যা মাঝিরা হাত দিয়ে ধরে জলে ডুবিয়ে জল ঠেলে ঠেলে নৌকা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

মাঝিদের এহেন পেশাকেন্দ্রিক ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর গবেষণার এলাকা খুলনা জেলা। গবেষক বলেন– ''পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যস্থলে অবস্থিত খুলনার উচ্চারণ কতকটা পূর্ববঙ্গের মতো, আবার কতকটা পশ্চিমবঙ্গের মত। আবার অনেক স্থলে তাহার উচ্চারণে একটা স্বাতন্ত্র্যও আছে।''[৪] লেখক উদাহরণের সাহায্যে এই স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রবন্ধে তাঁর আলোচনায় বেশি করে উঠে এসেছে মাঝিদের কর্মকেন্দ্রিক ভাষা প্রসঙ্গ। দীর্ঘ ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে তিনি যেসব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তার কিছুটা নিম্নে তুলে ধরা হল–

নাও বা লাও–	নৌকা
দাড়্–	দাঁড়
চোড়–	লগি
গোলোই–	নৌকার অগ্রভাগের ত্রিভূজাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড
টাবুরে নাও–	ছোটো নৌকা
বাদাম–	পাল
ফুকোর–	জানালা
মুহোড় বাতাস–	প্রতিকূল বাতাস
চড়নদার–	পুরুষ যাত্রী
শোয়ারি–	স্ত্রী যাত্রী
ভ্যামতা–	নদীর মোড়

এমন আরও প্রচুর পেশাকেন্দ্রিক শব্দ আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক উল্লেখ করেছেন। পেশাকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণায় চক্রবর্তী মহাশয়ের এ কাজ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। একটা সময় মাঝি'রা সমাজের একটা বিশেষ অংশ ছিল, কারণ সমাজের সমস্ত শ্রেণির মানুষ তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলে মাঝিদের সামাজিক মূল্য কমে গিয়েছে, মাঝিদের পেশারও ক্ষতি হয়েছে। একটা সময় পালতোলা নৌকা, বৈঠা টানা নৌকা ছিল অত্যন্ত পরিচিত বিষয়। বর্তমানে এই প্রকার নৌকার প্রচলন কমে গিয়ে মোটর চালিত নৌকা প্রচলিত হয়েছে। ফলে প্রাচীন মাঝি সম্প্রদায়ের কর্মকেন্দ্রিক ভাষা অবলুপ্তির পথে। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যদি 'খুলনা জেলার মাঝির ভাষা' নামক প্রবন্ধ রচনা না

করতেন তাহলে হয়তো মাঝিদের পেশা কেন্দ্রিক বহু শব্দই আজ হারিয়ে যেত। বাংলাদেশে নৌকায় যাতায়াত অতি প্রচলিত বিষয়। তাই মাঝিদের ভাষা সেখানে বেশ পরিচিত। কিন্তু আমাদের দেশে নৌকায় যাতায়াত বর্তমানে প্রায় উঠেই গিয়েছে। বিশেষত শহর অঞ্চলের মানুষের কাছে নৌকায় যাতায়াত এখন শৌখিনতার বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই এখন আমাদের কাছে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধের মূল্য অসীম। কারণ তাঁর প্রবন্ধ ছাড়া বর্তমানে আমরা জানতেই পারতাম না অনুকূল বাতাসের প্রতিশব্দ 'পিঠেম বাতাস', প্রতিকূল বাতাসের প্রতিশব্দ 'মুহোড় বাতাস', ঝড় বা তুফান এর প্রতিশব্দ 'তুতোন', বৃষ্টির প্রতিশব্দ-'ডক' প্রভৃতি। যেদিন মাঝি মাল্লারা আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হত সেদিন আলাদা করে তাদের ভাষা নিয়ে গবেষণা না করলেও চলতো; কিন্তু বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণা ছাড়া কর্ম কেন্দ্রিক ভাষা ও শব্দকোষের সংরক্ষণ সম্ভব নয়। পেশা কেন্দ্রিক ভাষা গবেষণার প্রয়োজনীয়তা এ কারণেই অত্যন্ত বেশি। আলোচ্য প্রবন্ধে পেশাকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন প্রাবন্ধিক। তিনি বলেন--''বাঙ্গলার মাঝি মাল্লারা যে ভাষায় কথা বলে,--যে সকল পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে, তাহাদিগকে ভাষায় স্থায়ী আসন দান না করিলে আমাদের মাতৃভাষা কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ লাভ করিতে পারিবে না।'' [৫] প্রাবন্ধিকের এমন মতামতকে আমরা সর্বাংশে সমর্থন করি। কারণ মানুষের অন্যান্য পরিচয় অপেক্ষা কর্মকেন্দ্রিক পরিচয়ই সর্বাপেক্ষা বড়। কর্মই মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম। ফলে কর্ম পরিমণ্ডলের ভাষাকে দূরে সরিয়ে রাখলে মাতৃভাষার শব্দ ভাণ্ডার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মানুষের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম বহু বিচিত্র। একই ভাবে সব পেশারই নিজস্ব কিছু শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্‌রীতি থাকে। সেই বিচিত্র কর্মপরিমণ্ডলে লুকিয়ে থাকা ভাষিক উপাদান মাতৃভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণার পরম্পরায় অশোককুমার কুণ্ডু'র 'কামারশালের ভাষা' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কামারশালের পরিবেশ, কামার শালে তৈরি ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও কামারশালার ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কামার শালের পরিবেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন– ''কামার ঘরের দরজা বাঁশেরই হয়, খুব একটা মজবুত কিন্তু হয় না। চৌকাট থেকে ঢোকার মুখেই মাথাটা একটু নিচু করতে হয়, না হলে ওপরে 'গোবরা কাঠে' মাথা ঠুকবে। কামারশালা আসলে

চালাঘর। দেওয়ালের পাট বেশি থাকে না। উচ্চতা বেশি হয় না। ঘরের ভিতরে নামমাত্র জানালা থাকে। একে জানালা না বলে ঘুলঘুলি বলাই ভালো।'' [৬] এ প্রবন্ধে গবেষক কামারদের পেশা কেন্দ্রিক ভাষার বেশ কিছু নমুনা দিয়েছেন। যেমন– 'পাজিয়ে', শব্দটি কামারদের কর্ম কেন্দ্রিক শব্দ– কামারশালার নিজস্ব শব্দ। 'পাজানো' কথাটির অর্থ হল–লোহাকে পুড়িয়ে প্রয়োজনীয় আকার দেওয়ার জন্য পোড়ানো লোহাকে ছোটো বা বড়ো হাতুড়ি দিয়ে প্রচুর আঘাত করা হয়। পোড়ানো লোহার উপর আঘাত করা বা ঘা মারার ক্ষেত্রে পাজানো শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 'আতাস লাগা' শব্দটি কামারশালের নিজস্ব শব্দ। আতাস লাগা বলতে বোঝান হয় তাপ লাগা বা আঁচ লাগাকে। কোনো লোহাকে পোড়াতে আরম্ভ করার পর যথাযথ ভাবে পোড়ানো হলে কামাররা বলে লোহায় 'আতাস' লেগেছে। 'ডেও ঢ্যাকনা'– কথাটি আমাদের গৃহস্থ জীবনের পাশাপাশি কামারশালেও ব্যবহৃত হয়। 'ডেও ঢ্যাকনা' হল সেইসব জিনিস যা ফেলে দেওয়া যায় না, অথচ ফেলে দেওয়ার মত। কিন্তু পরে কোনো কাজে লাগবে এই আশায় রেখে দেওয়া হয়। কামারশালায় এমন বহু জিনিস পড়ে থাকে, যা কোন কাজে লাগে না, অথচ কোনো এক সময় কাজে লাগবে এই আশায় কামাররা তা রেখে দেয়। এই রকম জিনিসগুলোকেই কামাররা 'ডেও ঢ্যাকনা ' বলে। কামার শালের ভাষার এইসব নমুনা অশোককুমার কুণ্ডু তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন। কামারশালা কেন্দ্রিক এই শব্দগুলি অবশ্যই ঐ পেশার স্বরূপকে আমাদের কাছে আরও সুস্পষ্ট করে তোলে। আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে আমরা কামারশালা সম্পর্কে বহু তথ্য পাই যা হয়ত প্রবন্ধটা না থাকলে পাওয়া যেত না। তবে এ প্রবন্ধে কামারদের পেশা কেন্দ্রিক ভাষার নমুনা কম। যা আরও বেশি থাকা উচিত ছিল। গবেষক এ বিষয়ে উপযুক্ত সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেননি। যদি পারতেন তবে পেশাকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণার উৎকষ্ট নমুনা হিসাবে প্রবন্ধটি বিবেচিত হত।

আমাদের সমাজের কিছু নারী তাদের শরীরের বেসাতি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এইসব নারীরা বারবনিতা বলে পরিচিত। বারবনিতা বর্তমানে একটা পেশায় পরিণত হয়েছে। বহু নারী প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। বারবনিতাদের পেশা কেন্দ্রিক ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রবন্ধের নাম 'বারবনিতার ভাষা'। এ প্রবন্ধে গবেষক বারবনিতাদের জীবন ও কর্মের নানা পরিচয় দিয়েছেন। সে প্রসঙ্গে উঠে এসেছে তাদের কর্মমূলক ভাষা প্রসঙ্গ। গবেষক বলেছেন

বারবনিতারা তাদের শরীরকে 'মেসিন' নামে পরিচিত করে। কোনো এক বারবনিতার উক্তি এক্ষেত্রে গবেষক তুলে এনেছেন– ''মেসিনকে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার রাখতে হয়। আমরাও আমাদের দেহকে তেলসাবান মেখে পরিষ্কার রাখি; তা নইলে কি কেউ মুখ দেখে পয়সা দেবে!" [৭] নিজেদের পেশার কথা বলতে গিয়ে অনেক বারবনিতাই বলে– ''আমরা যৌন বিক্রি করি"। [৮] এখানে লক্ষণীয় 'বিক্রি' শব্দটি। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে বিক্রি শব্দটি এদের উচ্চারণে 'বিক্রি' রূপ নিয়েছে। বেশ্যাবৃত্তির পোষাকি নাম হিসাবে এরা ব্যবহার করে– 'লাইন' শব্দটি। 'নাড়ি' শব্দটি এরা জরায়ুর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করে। প্রবন্ধটি থেকে বারবনিতাদের পেশা সংক্রান্ত ভাষার আরও নমুনা পাওয়া যায়। যেমন-খরিদ্দার না পাওয়া, রোজগার কম হওয়া তাদের কাছে 'পটে লাথি পড়া'। খরিদ্দার পাওয়া, তার সঙ্গে যৌন সংসর্গ করাকে তারা 'বাবু করা', 'বাবু বসানো' বলে চিহ্নিত করে। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বারবনিতাদের ভাষার যা নমুনা দেখিয়েছেন পরিমাণে কম হলেও তা যথেষ্ট তাৎপর্যমণ্ডিত। সংশ্লিষ্ট উদাহরণ থেকে বারবনিতাদের পেশাকেন্দ্রিক ভাষার প্রাথমিক ধারণা অবশ্যই তৈরি হয়। ভাষার পাশাপাশি এই পেশার মানুষদের মানসিকতার চিত্রও ভালোভাবে অঙ্কন করেছেন তিনি। বারবনিতারা নিজেদের পেশা নিয়ে কী মনোভাব পোষণ করে? সতীত্ব, নারীত্ব, সম্ভ্রম বোধ ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মানসিক অবস্থান ঠিক কেমন তা নিয়েও দারুন আলোচনা করেছেন। স্বেচ্ছায় কেউ বেশ্যাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে বেছে নেয় না। সমাজের পাশবিক অত্যাচারে পরাজিত হতে হতে কোনো এক সময় কোনো কোনো নারী এই পথে পা বাড়ায়। তারপর দিনের পর দিন চলে অন্তরে অন্তরে রক্তক্ষরণ। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক এক যৌনকর্মীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। মন্তব্যটি হল--''রোজ রোজ অচেনা লোককে নিজের শরীরটা দেখাতে কারোর ভালো লাগে বলুন!" [৯] দিনের পর দিন নারীত্বের অসহায় লাঞ্ছনার ইতিকথা এই মন্তব্যে পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। সব মিলিয়ে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি পেশাকেন্দ্রিক ভাষার আলোচনায় এক অসামান্য দলিলে পরিণত হয়েছে।

নারী ভাষা নিয়ে কাজ করেছেন গবেষক ড. সাইফুল্লা। তাঁর গবেষণা সন্দর্ভ'' উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নারী ভাষা''য় বারবনিতাদের ভাষার কিছু নমুনা উদ্ধৃত হয়েছে। গবেষক যৌনকর্মীদের ভাষা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি ও ধান্যকুড়িয়ায় অবস্থিত পতিতা পল্লিতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করে যৌনকর্মীদের পেশা কেন্দ্রিক ভাষার নমুনা সংগ্রহ করেছেন। তাঁর সংগৃহীত নমুনা যেমন-

গবেষক : তোমার শরীর এত খারাপ ক্যান

যৌনকর্মী : শরীর আর কি করে ভাল হবে, সারাক্ষণ তো জেনাটার চলতিই আছে।

... .

গবেষক : কি গো হবে?

যৌনকর্মী : না আমার বর বাড়ি রয়েছে এখন খদ্দের বসান যাবে না।

....

যৌনকর্মী : শোন দেড়শ টাকা দাও থেকে যাও এর কমে কেউ দেবে না।

গবেষক : না অত টাকা নেই।

যৌনকর্মী : তাইলি শটে যাও কি আছে।

....

যৌনকর্মী : এই খান্‌কির ছেলে তাড়াতাড়ি কর নইলি পাছায় লাথি মেরে তুলে দোব।

গবেষক : এই লাথি মারবি মানে! টাকা দিয়েছি।

যৌনকর্মী : ও আমার চুতমারানি মোর, টাকা দে আমার বাল ছিঁড়ে নেছ। তোমার মত কত বাড়ার হোল দেখলাম। [১০]

উদ্ধৃত সাক্ষাৎকার থেকে যৌনকর্মীদের ভাষা বৈশিষ্ট্য বিষয়ে নানা তথ্য পাওয়া যায়। যৌনকর্মীদের ভাষায় কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহারের প্রবণতা অনেক বেশি। আলোচ্য ক্ষেত্রে 'জেনাটার', 'শটে যাওয়া' ইত্যাদি কোড ল্যাঙ্গুয়েজের উদাহরণ। আবার কোড ল্যাঙ্গুয়েজ নয় এমন বহু শব্দও এরা ব্যবহার করে। দেহ বিক্রি একপ্রকার ব্যবসা। ফলে ব্যবসার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দরাজিকে এরা নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে ব্যবহার করে। যেমন– ''খদ্দের বসান যাবে না', খদ্দের শব্দটি যেকোনো ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ। যৌনকর্মীরা তাদের ঘরে আগত পুরুষদেরকে 'খরিদ্দার' বলে বিবেচনা করে। যৌনকর্মীদের উচ্চারণে 'খরিদ্দার' হয়েছে 'খদ্দের'। এই ধ্বনি পরিবর্তনের মূল কারণ যথাযথ শিক্ষার অভাব ও পুরুষ শাষিত সমাজের প্রতি বা বলা যায় পুরুষ সমাজের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও অবজ্ঞা। ড. সাইফুল্লা যৌনকর্মীদের ভাষার যে নমুনা সংগ্রহ করেছেন তাতে একজন যৌনকর্মীর ভাষায় প্রচুর স্ল্যাং এর ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। গবেষক মনে করেন জীবনের রূক্ষ বাস্তবতা নারীত্বের কোমল অনুভুতি গুলিকে

নষ্ট করে দিয়েছে। ফলে ভাষা ব্যবহারে যে মার্জিত ভাব থাকা উচিত এদের ভাষায় সেটা নেই। ক্রমাগত বঞ্চনার শিকার হতে হতে এরা আস্তে আস্তে হিংস্র হয়ে উঠেছে। তাই এদের ভাষাছাঁদে কোনো নারী সুলভ কোমলতা নেই।

ভাষার উপর কর্মজীবনের সর্বময় প্রভাবের কারণে সমাজভাষাবিজ্ঞানের ধারায় বর্তমানে কর্মভিত্তিক ভাষার আলোচনা প্রাধান্য পাচ্ছে। কর্মভিত্তিক ভাষা গবেষণায় নারী ভাষার গুরুত্ব নিতান্ত কম নয়। কারণ আমাদের সমাজের নারীরা এখন আর কেবলমাত্র গৃহবধূ নয়। গৃহ পরিবেশের বাইরে যে বিরাট কর্মজগৎ—বর্তমানের নারীরা সেই বিরাট কর্মজগতের বড়সড় অংশীদার। বর্তমান কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে সমান মাত্রায় অংশ নিয়েছে নারীরাও। গৃহ পরিবেশের বাইরের কর্মজগতে নারীরা অংশ নিলেও গৃহপরিবেশে নারীদের কর্মকাণ্ডের সীমানা নিতান্ত কম নয়। সামাজিক কর্মজগতের এক বিশাল অধ্যায় গৃহকাজ। এ কাজে নারীদের ভূমিকাই প্রধান। ড. সাইফুল্লা তাঁর গবেষণা সন্দর্ভ 'উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নারীভাষা'য় কর্মভেদে নারী ভাষার কেমন পরিবর্তন ঘটে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর আলোচনাকে বিন্যস্ত করেছেন নারীদের কর্মজগৎকে একাধিক শ্রেণিতে বিভক্ত করে। তাঁর মতে মেয়েদের কর্মজগৎ গৃহকাজ, গৃহ পরিবেশের অন্যান্য কাজ— যথা- মাঠের কাজ, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, সেলাই এর কাজ, ঠিকে-ঝি'র কাজ, ধান-ভাপান, চাল কোটা প্রভৃতি। আবার গৃহ পরিবেশের বাইরের কাজ— যথা- কৃষি শ্রমিক, কারখানার শ্রমিক, কারখানার পরিচারিকা, রং মিস্তিরি ও লেবার, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি শ্রেণিতে বিভক্ত। নারীদের এই বিচিত্র কর্মজগতের আলাদা আলাদা নমুনা সংগ্রহ করেছেন গবেষক সাইফুল্লা। একাধিক নমুনা বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন নারীদের কর্মকেন্দ্রিক ভাষা বৈশিষ্ট্যকে। তাঁর গবেষণা লব্ধ নারী ভাষার নমুনা—

কৃষি শ্রমিক : ''আমি মাঠে মাঠে জোন খেটে, বুকির রক্ত জল করব, আর উনি মদ্দালোক মাল খেয়ে চিৎ হয়ে থাকবে। ছেলেমেয়ে গুলো সারাদিন ডা ডা করবে।''

এক্ষেত্রে গবেষকের ভাষ্য এইরকম--শ্রমজীবী মহিলাদের মধ্যে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়। কিন্তু কৃষি শ্রমিকরা থেকে যায় গ্রামেই। তাই তাদের ভাষায় নাগরিকতার রং লাগে না। বুকির রক্ত জল করা গ্রাম্য ভাষারীতিজাত। এ ভাষা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যবহার করে। মেয়েরা যখন কর্মের ক্ষেত্রে

পুরুষদের সহাবস্থান নিচ্ছে তখন ভাষা ব্যবহারের এই সহাবস্থান স্বাভাবিক। মাল খেয়ে চিৎ হয়ে থাকা, কঠিন জীবন অভিজ্ঞতার পীড়নে পীড়িত মেয়েদের মুখেই এ ভাষার ব্যবহার সম্ভব। জীবনে বাস্তবতার পীড়ন যতই মারাত্মক হোক, তা নারীর সজীব কোমল প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করতে পারে না। এক্ষেত্রেও তা হয়নি। সন্তান সন্ততির অনুষঙ্গে ভাষা তার যাবতীয় রুক্ষতা হারিয়ে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। 'ডা ডা করে' এই ছোট্ট বাক্যবন্ধটি মাতৃ হৃদয়ের বহু রক্ত রাঙা অনুভূতিকে চিনিয়ে দেয়। পুরুষের বাক্ ভাণ্ডারে সংক্ষিপ্ত অথচ এত তীক্ষ্ণ ভাষা বোধ হয় নেই, যা দিয়ে এত সহজে পুরুষের সন্তান স্নেহকে চিনে নেওয়া যায়। কর্মভেদে মেয়েদের মধ্যে ভাষাভেদ ঘটে সত্য, কিন্তু তা শেষ সত্য নয়। এক্ষেত্রে তাদের মাতৃত্বই প্রধান হয়ে উঠেছে।

গৃহকাজ : ''লোকে ঘুম থেকে ওঠে ঝ্যাটা হাতে করে, আর আমি উঠি হাঁড়ি মাথায় করে।''

এক্ষেত্রে গবেষকের ভাষ্য এইরকম--গ্রাম জীবনের সাধারণ সংস্কার অনুসারে মেয়েরা সকাল বেলা বাসি ঘর উঠোন ঝাট দিয়ে তবে অন্যান্য প্রাত্যহিক কর্মে মনোনিবেশ করে। এই সাধারণ জীবন সত্যের কথা আছে বক্তব্যের প্রথমাংশে ''লোকে ঘুম থেকে ওঠে ঝ্যাটা হাতে করে''। কিন্তু পরবর্তী কথাগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বক্তা এমন এক গৃহের গিন্নি যেখানে সকাল বেলায় বাড়ির সদস্যরা স্কুল, কলেজ, অফিস, কাছারিতে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত থাকে। ফলত বাড়ির গিন্নিকে রান্নার জন্য যথেষ্ট ব্যস্ত থাকতে হয়। তার কাছে তখন বাসি উঠোন ঝাট দেওয়ার বিষয়টি গৌণ। সে হয়ত প্রথমেই বাসি উঠোন ঝাটা দিয়ে নেয়, কিন্তু তা নিতান্তই অভ্যাস বসে। তার সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রিভূত থাকে রান্না- বান্নার বিষয়ে। সকাল বেলা রান্নার জন্য এই যে ব্যস্ততা, তাকে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য প্রাত্যহিক জীবন থেকে এক সুন্দর অনুষঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে– 'হাড়ি মাথায় করা'। জীবনে ব্যস্ততা সব মানুষেরই কম বেশি থাকে। তারা তা ভাষায় প্রকাশও করে, নিজ নিজ ঢঙে। হাড়ি মাথায় করার মত অনুষঙ্গ কেবলমাত্র গৃহস্থ জীবনের সঙ্গে একাত্মভাবে যারা জড়িয়ে থাকে, তাদের কথাতেই উঠে আসা স্বাভাবিক, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

রঙ মিস্ত্রির সহযোগী : ''আমি বলেছি, আমরা ডেলি ডেলি বাইরে যাই, আমাদের ভুল হতে পারে, আমরা খারাপ হতি পারি। তুই ক্যান ঘরে বসে খারাপ হবি?''

এক্ষেত্রে গবেষকের ভাষ্য এইরকম–ভাষা এখানে মার্জিত। 'বলেছি', 'ভুল হতে পারে' প্রভৃতি শিষ্ট বাক্‌রীতির অনুসারী, কিন্তু এ ভাষার মধ্যে থেকেও, অশিক্ষিত প্রায়, গ্রাম্য মেয়ে, যে কাজের সন্ধানে শহরে এসেছে, তাকে চিনে নেওয়া যায়। 'ডেলি ডেলি' ভাষার উপর নাগরিক অভিঘাতের ফল। 'ডেইলি' এই ইংরাজি শব্দটি এদের কাছে 'ডেলি' রূপ নিয়েছে। ডেইলি শব্দের অর্থ প্রতিদিন। বক্তা দুইবার ডেলি শব্দটি ব্যবহার করে প্রতিদিন বোঝাতে চেয়েছে। শব্দ ও তার অর্থ বিষয়ে যথাযথ ধারণা না থাকার কারণে এমনটা হয়েছে। 'খারাপ হতি পারি'– কথাটি এক ধরনের কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। খারাপ হওয়া বলতে এখানে বিশেষ অর্থে পর পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক তৈরির কথা বলা হয়েছে। এই কোড ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহারে মেয়েরাই সিদ্ধহস্ত। ছেলেদের ভাষায় এর বিশেষ প্রচলন নেই।

ব্যবসায়ী : ''একশ দশ টাকার বেশি পারব না, এতে যদি হয় হাবড়ার আগে বলিস''।

এক্ষেত্রে গবেষকের ভাষ্য এইরকম–বক্তা শাক সব্‌জির পাইকার। তারা গ্রামাঞ্চলের হাট বাজার থেকে সব্‌জি কিনে ট্রেনে চেপে কলকাতা বা পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চলে বিক্রি করতে যায়। কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ সব্‌জির দাম একশ দশ টাকার বেশি দেওয়া তার পক্ষে সম্ভবপর নয়, এই কথাটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। এই বলার ভঙ্গিটা মোটের উপর পুরুষালি। মেয়েরা ভাব বিনিময়ের সময় সাধারণ ভাবে অনেক বেশি কথা বলে, অনেক বেশি শব্দ ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। কথাটি হওয়া স্বাভাবিক ছিল এই রকম– 'শোন, তোর আবারও বলছি, একশ দশ টাকার বেশি এ মালে কিছুতেই দেওয়া যায় না'। এখানে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে মেয়েরা তাদের ভাষাকে যথাসম্ভব সংযত সাবলীল করে নিয়েছে। অনাবশ্যক শব্দকে নির্মম ভাবে বর্জন করেছে। পাইকারদের নিজস্ব কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহারেও তাদের কোনো জড়তা নেই। 'হাবড়ার আগে বলিস'- অর্থে হাবড়া লোকালের সময়ের আগে। অর্থাৎ হাবড়া লোকালের সময় যদি হয় ১১টা ২২ মিনিট, তবে ঐ সময়ের আগে জানাতে বলা হয়েছে।[১১]

উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে পেশাভেদে নারী ভাষার পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা যায়। আমাদের সমাজে কর্মভেদে নারীর নানা পরিচয় সূচিত হয়। গৃহবধূ, ব্যবসায়ী, মিস্তিরি প্রভৃতি। নারীদের এই বিচিত্র পরিচয়ের প্রভাব পড়ে তাদের ভাষায়। সাংসারিক কাজ প্রতিনিয়ত করতে করতে গৃহবধূরা বিরক্ত হয়ে যায়। একটা সময় তাদের মনে হয়, সংসার তাদের জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

ফলে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব জন্মায় তাদের মনে। ভাষার উপর এই বিতৃষ্ণার অনিবার্য প্রভাব পড়ে। যখন কোনো নারী বলে– 'আমি উঠি হাড়ি মাথায় করে' তখন বোঝা যায়, প্রতিদিনকার রান্নার কাজে সে কোনো আনন্দ খুঁজে পায় না। সন্তান পালন নারী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। দিনের পর দিন এই দায়িত্ব সামলাতে সামলাতে কোনো নারী যখন তার প্রাণপ্রিয় সন্তান এর উদ্দেশ্যে বলে ফেলে– ''হাড় জ্বালানো ছেলেটা মরলেই বাঁচি'' তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না জীবনের ক্লান্তিময় রুটিন তার কোমল নারীসত্তাকে আহত করেছে। যেসব নারীদের প্রতিদিন ঘরের বাইরে কাজ করতে যেতে হয় তাদের সাংসারিক জীবন ব্যাহত হয়। কর্মপরিমণ্ডলের মধ্যে পার্থিব সুখ শান্তি খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে কোনো কোনো নারী। তাই কর্ম সঙ্গীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়াকে তারা বিশেষ পাপ বলে মনে করে না। তাদের এই মানসিকতা কিন্তু জন্মগত নয়। বস্তু তান্ত্রিক পৃথিবীর শোষণে শোষিত হতে হতে তারা এক সময় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। স্বামী ব্যতিরেকে অন্য পুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেও তাদের মধ্যে কোনো পাপবোধ কাজ করে না। মফস্‌সল শহর থেকে যেসব নারীরা শহর কলকাতায় নানা কাজের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ট্রেনে বাসে যাতায়াত করে তাদের ভাষার সঙ্গে গৃহপরিবেশের নিরাপদ আশ্রয়ে বসবাসকারী নারীদের ভাষার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ লক্ষ করা যায়। ট্রেনে বাসে দৈনিক যাতায়াত করা শ্রমিক মেয়েদের ভাষা, আচার-আচরণ অনেকাংশে পুরুষালি। যা গৃহস্থ মেয়েদের মধ্যে দেখা যায় না। আসলে কর্মজীবন মানুষের ব্যক্তি জীবনের উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। একজন শ্রমিক এর জীবন আর একজন সরকারি চাকুরের জীবন এক নয়। আবার একজন পুরুষ শ্রমিকের জীবন ও একজন নারী শ্রমিকের জীবনও এক নয়। পুরুষ শ্রমিক তার কর্মের বিনিময়ে পয়সা উপার্জন করে, অন্যদিকে নারী শ্রমিককে পয়সা উপার্জনের জন্য কর্মের পাশাপাশি তার ইজ্জতকেও বিকিয়ে দিতে হয়। কর্মভেদে, ব্যক্তিভেদে, নারী-পুরুষ ভেদে জীবনের এই যে বৈচিত্র্য, তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে ভাষার উপর।

পেশাকেন্দ্রিক ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন গবেষক জাহাঙ্গীর আলম জাহিদ। তাঁর ভাষা গবেষণার ফলাফল–''কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস''। এই গ্রন্থে গবেষক সামাজিক স্তরভেদে ভাষা বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। মূলত কুমারখালী অঞ্চলকে গবেষক তাঁর গবেষণা ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন। গ্রন্থের নামকরণও সেই অনুযায়ী। বর্তমানে কুমারখালী এলাকাটি বাংলাদেশের

অন্তর্গত। ১৯৪৭ সালের আগে এটি নদীয়া জেলার অংশ ছিল। দেশভাগের পর তা বাংলাদেশের সীমানা ভুক্ত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে গবেষক নারী ও পুরুষের ভাষা, শিক্ষিতদের ভাষা, অশিক্ষিতদের ভাষা, হিন্দুদের ভাষা, মুসলমানদের ভাষা প্রভৃতি সামাজিক স্তরভেদে ভাষা বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন। আর এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন পেশাগত ভাষা, সুইপারদের ভাষা, কুলিদের ভাষা নিয়ে। পেশাভেদে ভাষাভেদ বহুল পরিচিত বিষয়। জীবিকার জন্য আমরা নানা রকম পেশার আশ্রয় নিই। পেশা অনুযায়ী ভাষা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। প্রত্যেকটি পেশার ক্ষেত্রে ভাষাভাষীরা নিজেদের অজান্তেই ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে। আলোচ্য গ্রন্থে গবেষক পেশাগত ভাষার দুটো বিশেষ দিককে উল্লেখ করেছেন। যথা– পেশার ব্যবহার্য কিছু বস্তু বা যন্ত্র এবং পেশার বিশেষ বাচনভঙ্গি বা ভাষিক প্রায়োগিক দিক। গবেষক পেশাভেদে ভাষাভেদের এই দুটো দিককেই তাঁর আলোচনায় তুলে এনেছেন। তিনি বলেন– ''একজন শিক্ষিত লোকের যেমন বই, খাতা, কলম ইত্যাদির প্রয়োজন তেমনি একজন কৃষকের প্রয়োজন লাঙ্গল, জমি, বীজ ইত্যাদি। আবার একজন উকিল, ডাক্তার, কিংবা সিনেমার অভিনেতার পেশার জন্যও কিছু বস্তু আছে। বস্তুকে বাদ দিয়ে পেশা কল্পনা করা যায় না। ডাক্তারের পেশায় যা ব্যবহৃত হয়, কৃষকের কাছে তা মূল্যহীন। তেমনি তাঁতীর পেশায় যে জিনিসের প্রয়োজন, কামার কিংবা কুমারের সে রকম জিনিসের কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনের নিত্যতা ও প্রয়োজনহীনতা ভাষার জগতকে আলোড়িত করে। ভাষা ছাড়া বস্তুকে চেনা যায় না, জানা না। পৃথক পৃথক পেশায় ব্যবহৃত জিনিস বা বস্তুকে চেনার জন্য ভাষায় পৃথক পৃথক নামে পেশাগত জিনিসগুলো অবস্থান করে থাকে।" [১২] প্রতিটি পেশায় কিছু কিছু ব্যবহার্য দ্রব্য আছে। আর আছে কিছু কোড ল্যাঙ্গুয়েজ। যেমন– কৃষকরা লাঙল, কোদাল, নিড়েন, ঝাঁকা প্রভৃতি বস্তু ব্যবহার করে চাষের কাজে। তাদের চাষ আবাদ সংক্রান্ত কিছু কোড ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে। যেমন- 'জো হওয়া', জ্যাটো ফসল, নাবি ফসল প্রভৃতি। আবার রাজমিস্তিরি পেশায় কড়াই, কর্নিক, উশো, পেটা কাঠ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। রাজমিস্তিরি পেশায়ও আরও কিছু কিছু কোড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। যেমন-আমা ইঁট, আধলা, পোয়া প্রভৃতি। এই ভাবে কামার, কুমোর, তাঁতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা, বাসের কণ্ডাকটরি প্রভৃতি পেশাতেও নিজস্ব কিছু শব্দ ও কোড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। এক পেশার শব্দাবলী অন্য পেশার মানুষরা সাধারণত ব্যবহার করে না। একজন শিক্ষক এমনিতে 'জ্যাঠো ফসল', 'নাবি ফসল' কথাটি ব্যবহার করবেন না বা একজন কৃষকও কখনই 'প্রভিশনাল ক্লাস', 'অফ পিরিয়ড'

কথাগুলি বলবে না। একজন কামার যেসব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে, একজন তাঁতি সেইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে না। ফলত ব্যবহার্য যন্ত্র সংক্রান্ত কথাবার্তায় কামারের সঙ্গে তাঁতির, কৃষকের সঙ্গে শিক্ষকের, ডাক্তারের সঙ্গে উকিলের পার্থক্য হয়ই। পেশাভেদে ভাষাভেদের এই দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন গবেষক জাহিদ।

পেশাগত ভাষায় প্রায়োগিক দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি পেশার বিশেষ বাচনভঙ্গি বা ভাষিক প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। এর উপর নির্ভর করেই পেশাগত ভাষা তার নিজস্ব মৌলিকতা বজায় রাখে। পেশাগত ভাষার ক্ষেত্রে ভাষার প্রায়োগিক দিকটি পেশা নিরপেক্ষ ভাবে পৃথক নয়। এক্ষেত্রে এক পেশার সঙ্গে অন্য পেশার ভাষায় প্রায়োগিক ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়। এই বিষয়ে গবেষক জাহিদ এর সিদ্ধান্ত– ''প্রতিটি পেশার জন্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন কিছু শব্দ আছে, তেমনি প্রতিটি পেশার ভাষার মধ্যেও পার্থক্য আছে। তবে পেশাগত ভাষায় যা দেখা যায় তা হলো এক পেশার ভাষা যে শুধুমাত্র সে পেশার জন্যই রক্ষিত থাকে তা কিন্তু নয়।" [১৩] গবেষক তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। যথা–

মাছ বিক্রেতা– মাছ নেবে গো ভাল মাছ আছে।

শাড়ী বিক্রেতা– শাড়ী নেবেন ... এক নম্বর ভালো শাড়ী।

ফেরিওয়ালা– নেবেন গো, চুড়ি আছে, লাল ফিতে আছে।

উদাহরণ গুলো থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ব্যবসায়ীদের ভাষিক পদ্ধতি প্রায় এক। মাছ বিক্রেতা, শাড়ী বিক্রেতা, ফেরিওয়ালার উদ্দিষ্ট দ্রব্য বিক্রি করার ভাষা প্রায় এক। এক্ষেত্রে পেশা ভেদে কেবল দ্রব্যের নাম পাল্টে যাচ্ছে। যে কোনো দোকানদারের সঙ্গে ক্রেতার কথোপকথনও প্রায় এক। যেমন–

ক্রেতা– প্যাণ্টার দাম কত?

দোকানদার– পাঁচশ টাকা। ১

ক্রেতা– বেগুন কত করে?

সব্জি বিক্রেতা– কুড়ি টাকা কেজি।

আলোচ্য ক্ষেত্রেও দ্রব্যের নাম ছাড়া ভাষা প্রায় এক রকম। আসলে যে সব পেশার সাথে বিপণন বিষয়টা জড়িয়ে আছে, সে সব পেশায় বিপণন কেন্দ্রিক ভাষার প্রায়োগিক রূপ প্রায় এক। কিন্তু বিপণনের

বাইরে পেশাগত ভাষার ভাষিক প্রয়োগ একেবারে আলাদা। বিপণন নিরপেক্ষ পেশায় ভাষার প্রায়োগিক দিক পেশাভেদে পাল্টে যায়। একজন শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল যেভাবে কথা বলে, একজন রাজমিস্তিরি বা একজন ছুতোর মিস্তিরি সেভাবে কথা বলে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে শিক্ষা একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করে। শিক্ষার কারণে শিক্ষক, ডাক্তারদের ভাষায় ইংরাজি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যা কোনো রাজমিস্তিরির ভাষায় পাওয়া কঠিন। শিক্ষক, ডাক্তার, উকিলদের ভাষা যতটা মার্জিত, কৃষক, পাইকার, দোকানদারদের ভাষা ততটা মার্জিত নয়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় শিক্ষক, ডাক্তাররা যে পরিবেশে কাজ করে কৃষক, পাইকার, ব্যবসায়ীরা তেমন পরিবেশ পায় না। জনসাধারণের সঙ্গে তর্কাতর্কি, ঝগড়া, ঝামেলা করে তাদের কাজ করতে হয়। পরিবেশগত কারণে তাদের ভাষা অমার্জিত হয়ে পড়ে। ভাষায় স্ল্যাং এর ব্যবহারও এসে পড়ে। যা শিক্ষক, ডাক্তারদের ভাষায় প্রায় থাকেই না। ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, কোড ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষার প্রায়োগিক দিক ইত্যাদির কারণে পেশা নিরপেক্ষ ভাবে ভাষা বদলে যায়। এর পাশাপাশি সামাজিক পরিবেশ-প্রতিবেশের কারণেও পেশাভেদে ভাষাভেদ তৈরি হয়। পেশাভেদে ভাষাভেদ প্রসঙ্গে গবেষক জাহিদ এর সিদ্ধান্ত বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য–

''ভাষা ব্যবহারের প্রথম পর্যায় থেকেই পেশাগত ভাষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পেশাগত কারণে ভাষার ব্যবহারের জন্যই মূলত ভাষায় প্রায়োগিক বৈচিত্র্য এসেছে। পেশাগত কারণে ভাষা ব্যবহারের জন্য ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি ভাষা মানব জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাসের জন্য পেশাগত ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। এক এক পেশাকে এক এক রকম শব্দ, খণ্ডবাক্য কিংবা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এই ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, খণ্ডবাক্য কিংবা বাক্যের অর্থের ভিন্নতার জন্য পেশাগত ভাষার শ্রেণী বা স্তরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।'' [১৪]

পেশাকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণার বিশেষ উদাহরণ অধ্যাপক ড. গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ''রাঢ় ভুমির কৃষিকেন্দ্রিক লোকভাষা ও সংস্কৃতি'' নামক গ্রন্থটি। এ গ্রন্থে গবেষক রাঢ় ভূমির কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। গবেষক পেশাকেন্দ্রিক ভাষাকে লোকভাষা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে– ''লোকভাষা বৃত্তি-অনুগত। অবশ্য কর্ম-অনুগত বললেই বোধ

করি যথাযথ হ'তে পারে। কৃষক, শ্রমিক, জেলে, তাঁতী, ধোপা, কলু, ময়রা, কামার, কুমোর প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র লোকভাষা বিদ্যমান। একশ্রেণীর অর্থাৎ এক বৃত্তির মানুষদের ভাষার সঙ্গে অন্যবৃত্তির মানুষদের ভাষায় অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। অবশ্য একথাও ঠিক যে, উপরিউক্ত শ্রেণী বা সম্প্রদায় সামগ্রিকভাবে পৃথক নাও হ'তে পারে। যেমন--একজন তাঁতীর কৃষক হওয়াতে বাধা নেই। অনুরূপ ভাবে একজন জেলে শ্রমিক হ'তে পারে। তথাপি বৃত্তিগত প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভাষাগত পার্থক্য থাকবেই।" [১৫]

কৃষিকাজ মানুষের প্রাচীনতম জীবিকা। আমাদের দেশের প্রচুর সংখ্যক মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। ফলত কৃষিকেন্দ্রিক বিশেষ ভাষাছাঁদ গড়ে ওঠা আশ্চর্য নয়। গবেষক গোপেন্দু মহাশয় সেই কৃষিকেন্দ্রিক ভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং তাঁর গবেষণা লব্ধ ফলাফল 'রাঢ়ভূমির কৃষিকেন্দ্রিক লোকভাষা ও সংস্কৃতি' নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র রাঢ় বাংলা। সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষিক্ষেত্র গুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে গবেষক কৃষি কেন্দ্রিক ভাষার বিপুল সম্ভার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি কৃষিজ ভাষাকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। যেমন– কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্র সংক্রান্ত ভাষা। উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত করেছেন– 'পাসুনি', 'টাকনা' প্রভৃতি শব্দকে। তাঁর মতে 'পাসুনি' হল সব্জি জাতীয় ফসলের আগাছা পরিষ্কার করার যন্ত্র। 'টাকনা' শক্ত মাটি কোপানোর যন্ত্র। এখানে কৃষিকেন্দ্রিক পরিবেশ, কৃষির রীতি-পদ্ধতি, কৃষিকাজের রীতি পদ্ধতির প্রয়োগ, কৃষিক্ষেত্রের স্বরূপ প্রকৃতি, কৃষি-শ্রমিক প্রভৃতি নানা উপবিভাগে ভাগ করে কৃষি ভাষার নমুনা দেওয়া হয়েছে।

গবেষক গোপেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণাকে কেবল মাত্র কৃষিকেন্দ্রিক ভাষার আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। কৃষিজ ভাষা আলোচনার পাশাপাশি রাঢ় বঙ্গের কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কৃতি'কেও তাঁর আলোচনার মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে কৃষিকেন্দ্রিক গান, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন প্রভৃতির অনুসন্ধান করেছেন। কৃষিসংস্কৃতিতে ব্যবহৃত একটি বিশেষ যন্ত্র হল- ঢেঁকি। গবেষক ঢেঁকি নিয়ে একটি লুপ্তপ্রায় লোক গানের সন্ধান দিয়েছেন। গানটির কয়েকটি পংক্তি–

''ও ধান ভানরে ভানি।

বৃন্দাবনে ধান ভানেন ষোলোসো গোপিনি।।'' [১৬]

'ঢেঁকি' যন্ত্রটির ব্যবহার কৃষি সংস্কৃতিতে ক্রমশ কমছে। গবেষক তাই উক্ত গানটিকে উদ্ধৃত করে বোঝাতে চেয়েছেন কৃষিকেন্দ্রিক বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির স্বরূপ। এছাড়া আরও অনেক গান, ও প্রবাদ প্রবচনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।--

''কলা বুনে না কেটো পাত।

তাতেই কাপড় তাতেই ভাত''

এমন আরও অনেক নমুনা সংগ্রহ করে গবেষক রাঢ় বাংলার কৃষি সংস্কৃতিকে আমাদের সামনে প্রাঞ্জল করে তুলেছেন। তাই বলা যায়, পেশাকেন্দ্রিক ভাষা গবেষণার ধারায় গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাজটি একটি অনন্য সংযোজন।

পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণার পরিমাণ বাংলা ভাষায় নিতান্ত কম হয়নি। উপরিউক্ত আলোচনায় আমরা তার বিস্তৃত পরিচয় নিয়েছি। এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় পেশাভিত্তিক ভাষা গবেষণার পরম্পরায় কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির আলোচনা কতটা তাৎপর্যপূর্ণ বা এর প্রয়োজনীয়তা ঠিক কতখানি। কৃষিকাজ মানুষের বহু প্রাচীন জীবিকা। শিকারমূলক ও আহরণ মূলক জীবিকার সীমা পেরিয়ে আমাদের প্রপিতামহরা সেই কোন দূর অতীতে কৃষিকাজ শুরু করেছিলেন। অতঃপর আজও তার ধারা সমান ভাবে বহমান। এখনও পৃথিবীতে বিশেষত আমাদের দেশে কৃষকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। বর্তমান ভারতবর্ষের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গে কৃষিজীবী মানুষের সংখ্যা তুলনা মূলকভাবে অনেক বেশি। ফলত এ রাজ্যে কৃষিকে কেন্দ্র করে যে আলাদা একটা সংস্কৃতি তৈরি হবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক বিশাল সংখ্যক মানুষ যখন এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তখন কৃষি ভাষা নামক ভাষার একটি আলাদা সংরূপ তৈরি হওয়াটাও আশ্চর্য নয়। সেদিক দিয়ে কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কৃষিকাজের ঐতিহ্য বহু প্রাচীন এবং বর্তমানেও একাজের ঐতিহ্য সমান মাত্রায় বজায় আছে। শুধু তাই নয় এ কাজের সীমা বর্তমানে আরও প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছে পৃথিবী, বদলে গিয়েছে মানুষের জীবনযাত্রা। ফলত কৃষকের ব্যক্তিজীবন ও কৃষিক্ষেত্রে পড়েছে

পরিবর্তনের অনিবার্য প্রভাব। এইসব পরিবর্তনের ধারা পথে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন সব ভাষা, হারিয়ে গিয়েছে অনেক পুরাতন ভাষিক উপাদান। একটা সময় কৃষিক্ষেত্রে কৃত্রিম জলসেচের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে চাষ আবাদ করা হত। ফলত কৃষিকাজে বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না। এখন কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে একই জমিতে নানারকম ফসল ফলান হচ্ছে, বছরের প্রায় সব সময়ই কোনো না কোনো চাষ করা সম্ভব হচ্ছে। এতে শুধু ফলনেই বৈচিত্র্য আসেনি, কৃষিভিত্তিক ভাষার সীমাও সম্প্রসারিত হয়েছে। সময়ের সাথে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিতেও পরিবর্তন এসেছে। যেমন- জমিতে চাষ দেওয়ার জন্য একটা সময় কেবলমাত্র গরুতে টানা লাঙল ব্যবহৃত হত। বর্তমানে সেখানে যন্ত্রচালিত লাঙল পাওয়ার টিলার ব্যবহৃত হচ্ছে বহুল পরিমাণে। যদিও গরুতে টানা লাঙলের ব্যবহার বর্তমানে একেবারে নেই একথা বলা যায় না। তবে যন্ত্রচালিত লাঙলের আবির্ভাবে গরুতে টানা লাঙলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে কমে গিয়েছে। তখন ধানঝাড়ার জন্য আমাদের প্রপিতামহদের হাতে ঝালন গড়ে ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ধান ঝাড়া মেসিন তৈরি করা হয়েছে। এই সব নতুন যন্ত্রপাতিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন শব্দ। পুরানো যন্ত্রপাতি'র ব্যবহার কমে যাওয়ায় তৎসংলগ্ন শব্দের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। অথচ কৃষিক্ষেত্রের এক বিশাল ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে শব্দগুলি। তাই সেগুলির সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। একটা সময় পর্যন্ত জমির উপর ব্যক্তি মালিকানা প্রযোজ্য ছিল না। তখন গোষ্ঠীর অধীনে সমস্ত জমি গচ্ছিত থাকতো। পরে ব্যক্তি মালিকানার প্রচলন হল। এল ভাগাভাগির প্রশ্ন। তিনভাগের একভাগ (তেভাগা), চার ভাগের একভাগ ইত্যাদি কথার প্রচলন তখন থেকেই। বিশ শতকের ছয় সাতের দশক থেকে আমাদের দেশে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভুঁইচাষি ও ভূস্বামীর সম্পর্ক একটা নতুন মাত্রা পেয়েছে। এই নতুন মাত্রাকে ধারণ করার জন্য গড়ে নেওয়া হয়েছে নিত্য নতুন শব্দ।

একটা সময় পর্যন্ত আমাদের দেশের কৃষকরা শুধু খেয়ে পরে বেঁচেবর্তে থাকার তাগিদে কৃষিকাজ করত। তখন সাংসারিক প্রয়োজন অনুসারে ধান, গম, মটর, মুসুরি, আলু, পটল প্রভৃতি চাষ করা হত। তখন বিক্রি বাটার বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ক্রমে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হল। বাজার অর্থনীতির প্রভাব ছায়াপাত করল কৃষক পরিবারের গভীরে। কৃষিক্ষেত্রেও পড়ল তার অনিবার্য

প্রভাব। নজর দেওয়া হল নগদ মুনাফার দিকে। যে অঞ্চলে যে ফসল ফলান অধিক লাভজনক তারই চাষ চলতে লাগলো বিশেষ করে। এর ফলে কোনো কোনো অঞ্চলে অপ্রচলিত হয়ে পড়ল বিশেষ কোনো ফসল; সেই সংক্রান্ত শব্দ, ভাষা এবং বিশেষ বিশেষ সংস্কৃতি। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় আঁখ চাষের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বর্তমানে ঐ জেলায় আঁখ চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ভাষা সংস্কৃতিতে লক্ষ করা গিয়েছে এর প্রভাব। হারিয়ে যেতে বসেছে বহুবিধ বাক্‌রীতি। যেমন– ঘানগাছ ওঠা, বানতোলা। সময়ের অভিঘাতে যেমন কোনো অঞ্চলে বিশেষ কোনো ফসল অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে তেমনই নতুন নতুন চাষেরও প্রচলন হয়েছে। ঐ সব চাষবাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে গড়ে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু নতুন নতুন শব্দ, কথা। কখনো বা পুরনো কোনো শব্দকে নতুন করে প্রাণ দেওয়া হয়েছে। গোণ্ডা, পোন প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার একটা সময় দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে প্রায় সর্বত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। বর্তমানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কলাচাষ, পানচাষ প্রচলিত হওয়ায় শব্দগুলি আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পটলের ফুলে ঠেকানো, লাউ এর মাচা দেওয়া এসব কথার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না আমাদের প্রপিতামহরা। তাঁরা প্রকৃতির উপর বরাত দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন। মৌমাছি সহ অনুরূপ কীট পতঙ্গের দ্বারা পরাগ মিলন ঘটে যা কিছু পটল হওয়ার হত। এখন পুংলিঙ্গ ফুল গুলিকে সংগ্রহ করে তা দিয়ে বিশেষ উপায়ে পরাগ মিলন ঘটানো হচ্ছে। বিষয়টিকে বলা হয় 'ফুল ঠেকানো'। রাসায়নিক সার প্রচলিত হওয়ার আগে জৈব সারের উপর নির্ভর করতে হত কৃষকদের।। জৈব সারকে তাঁরা বলত 'গুবরে সার'। গুবরে সার সংরক্ষণের জন্য তৈরি করা হত 'সারগাদা'। রাসায়নিক সারের দাপটে জৈব সার এখন অপ্রচলিত প্রায়। ফলে নষ্ট হয়েছে সারগাদার ঐতিহ্য। 'জোনের পান্তা' কথাটি এই সেদিন পর্যন্ত প্রতিটা সম্পন্ন কৃষক পরিবারে বহুল চর্চিত ছিল। এখন তাতে ভাটার টান শুরু হয়েছে। আগে যারা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করত, বিশেষ অর্থে 'জোন খাটতে' আসত তাদের পক্ষে পেটভরে একবেলা খেতে পাওয়াটাই ছিল বিরাট ব্যাপার। খাওয়ার কমতি হলে এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কৃষকের দুর্নাম হত। কৃষকরা তাই অত্যন্ত সচেতন থাকত এই ব্যাপারে। বাড়ির মেয়েরা আগের দিন রাত্রে যথেষ্ট পরিমাণে ভাত রেঁধে রাখত। সকাল সকাল তা মাঠে পাঠিয়ে দেওয়া হত। এখন জোনেদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এখন তাদের হাঁড়িতেও সকালে খেয়ে বেরোনোর মত ভাত অবশিষ্ট থাকে। এখন তারা কাজের বিনিময়ে খাওয়ার প্রত্যাশা করে না, তারা নগদ পয়সা চায়। ওদের কথায় 'জোনের দাম'। জোনের দামের সঙ্গে

এখন কৃষি শ্রমিকরা খাওয়া বাবদ নগদ পয়সা দাবি করে। নগদ পয়সা নেওয়ার প্রবণতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, জোনের পান্তা'র রেওয়াজ তত হ্রাস পাচ্ছে। 'মেন্দার' কথাটি এখন দক্ষিণবঙ্গের কোথাও কোথাও অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। বছর কুড়ি আগেও কথাটা অনেক জায়গায় শুনতে পাওয়া যেত। তখন গ্রামের হত দরিদ্র মানুষদের অন্যের জমিতে কাজ করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কাজের লোক সবসময় পাওয়া যেত। ফলে খেটে খাওয়া মানুষরা সারাবছর নিয়মিত কাজ পেত না। ওদের কথায় 'জোন বইত' না। এদিকে জোন না বইলে উনুনে হাড়ি চড়ে না। এই অবস্থায় সারা বছর নিশ্চিন্তে কাজ পাওয়ার লক্ষে কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে কোনো সম্পন্ন কৃষকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হত। চুক্তিবদ্ধ ঐ শ্রমিককেই বলা হত 'মেন্দার'। এখন অনেক বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে এখন আর শ্রমিক উদ্বৃত্ত নয়। কাজেই 'মেন্দার' এর ধারণা এখন আর তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোন শ্রমিককে এখন আর মেন্দার হতে হয় না। একটা সময় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র কৃষিজ দ্রব্য বহন করার জন্য গরুর গাড়ি ব্যবহৃত হত। গরুর গাড়ি যারা চালাত তাদের 'গাড়োয়ান' বলা হত। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে গরুর গাড়ির ব্যবহার নেই বললেই চলে। ফলে 'গাড়োয়ান' শব্দটি দক্ষিণবঙ্গের কৃষি সংস্কৃতি থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। গরুর গাড়ি যেমন বর্তমান কৃষিক্ষেত্র থেকে হারিয়ে গিয়েছে তেমন গরুর গাড়ি সম্পর্কিত আরও অনেক শব্দ যেমন– 'গড়ে', ধুরো, আংটা শব্দগুলির ব্যবহারও কমে গিয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি সংস্কৃতির এহেন আরও অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। অনেক অনুষঙ্গ কৃষি সংস্কৃতি থেকে অবলুপ্ত হয়েছে। আবার নতুন নতুন বহু অনুষঙ্গ বর্তমানে প্রচলিত হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা চাষবাসের ক্ষেত্রে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করতই না। এখন কৃষকদের মুখে হামেশাই ইংরেজি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আদ্যন্ত কৃষক পরিবার বলতে যা বোঝায় এখন তার সংখ্যা খুবই কম। পরিবারের প্রত্যেকে এখন আর কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। কেউ কেউ নিয়মিত কলকাতায় বা নিকটবর্তী শহরে কাজ করতে যায়। এর কমবেশি প্রভাব পড়ে পরিবারের ভাষিক মানচিত্রে। গ্রাম থেকে যেসব মানুষ প্রতিদিন শহরে যাচ্ছে সন্ধ্যায় আবার ফিরে আসছে তারা। মেলামেশা হচ্ছে পরস্পরের মধ্যে। এতে পারিবারিক ভাষিক মানচিত্রের পাশাপাশি সামাজিক মানচিত্রও বদলে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজের ভাষা সংস্কৃতি নিজস্ব রঙে রঞ্জিত হচ্ছে।

দক্ষিণবঙ্গের কৃষক সমাজে প্রচলিত ভাষা-সংস্কৃতি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কৃষি কেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতির এক বিশাল অধ্যায়কে ধারণ করে আছে। লুকিয়ে আছে সমাজ ইতিহাসের বহুবিধ উপাদান। ইতিহাস চর্চার প্রচলিত পথে সমাজেতিহাসের যে সব অধ্যায় অধরা থেকে যায় কৃষিকেন্দ্রিক ভাষা সংস্কৃতি চর্চার সূত্রে পৌঁছে যাওয়া যায় তার গভীরে। আমরা সেই লক্ষ্যে কিছুটা পথ চলার চেষ্টা করেছি।

তথ্যসূত্র

১. মল্লিক, ভক্তিপ্রসাদ, অপরাধ জগতের ভাষা ও শব্দকোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ: ২৭

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), বাঙালির ভাষাচিন্তা (সমাজভাষা), সেন, সুকুমার, বর্ধমানের মুচিদের ভাষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ৯৩

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), বাঙালির ভাষাচিন্তা (সমাজভাষা), সেন, সুকুমার, বর্ধমানের মুচিদের ভাষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ৯৩

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), বাঙালির ভাষাচিন্তা (সমাজভাষা), চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ, খুলনা জেলার মাঝির ভাষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ১১০

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), বাঙালির ভাষাচিন্তা (সমাজভাষা), চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ,খুলনা জেলার মাঝির ভাষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৩, পৃ: ১১০

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), বাঙালির ভাষাচিন্তা(সমাজভাষা), কুণ্ডু, অশোককুমার, কামারশালের ভাষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ১১৭

৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), বাঙালির ভাষাচিন্তা (সমাজভাষা), বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ,বারবনিতার ভাষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ১২১

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), বাঙালির ভাষাচিন্তা (সমাজভাষা), বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ,বারবনিতার ভাষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ১২১

৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পাদনা), বাঙালির ভাষাচিন্তা (সমাজভাষা), বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ,বারবনিতার

ভাষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ: ১২০

১০. সাইফুল্লা, গবেষণা সন্দর্ভ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নারী-ভাষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ২০০৬, পি এইচ. ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত

১১. সাইফুল্লা, গবেষণা সন্দর্ভ, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নারী- ভাষা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ২০০৬, পি এইচ. ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত

১২. জাহিদ, জাহাঙ্গীর আলম, কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০৪, পৃ: ১১৮

১৩. জাহিদ, জাহাঙ্গীর আলম, কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০৪, পৃ: ১২৩

১৪. জাহিদ, জাহাঙ্গীর আলম, কুমারখালীর ভাষার সামাজিক স্তর বিন্যাস, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০৪, পৃ: ১২৮

১৫. মুখোপাধ্যায়, ড. গোপেন্দু, রাঢ়ভূমির কৃষিকেন্দ্রিক লোকভাষা ও সংস্কৃতি, দীপালী বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ: ২

১৬. মুখোপাধ্যায়, ড. গোপেন্দু, রাঢ়ভূমির কৃষিকেন্দ্রিক লোকভাষা ও সংস্কৃতি, দীপালী বুক হাউস,কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ: ১৯